নারীপুরুষ

সজল খালেদ, জার্মানী।
shunnota@yahoo.com

নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কতখানি? শারিরিক পার্থক্যতো খালি চোখেই দেখা যায়, আর মনের গভীরে কি আসলেই কোন পার্থক্য আছে? নারীর চিন্তাধারা এবং মুল্যবোধ কি পুরুষের চেয়ে কিছুটা আলাদা? যদি কিছুটা আলাদাই হয়, তার জন্য সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রথা বেশী দায়ী, নাকি জিনতত্ত্বের কিছু নির্দেশও তাঁকে প্রভাবিত করে? আর রাসায়নিক হরমোনের ভূমিকাই বা এক্ষেত্রে কতটুকু?

একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিকভাবে গড়পরতা পুরুষ গড়পরতা নারীর চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী। দেহগতভাবেই পুরুষদেহ তুলনামুলক ক্ষিপ্র। উদাহরনহিসাবে বলা যায় ২০০৪ সালের অলিম্পিকে পুরুষ ১০০ মিটার দুরত্ব ৯.৮৪ সেকেন্ডে দৌড়ে এবং ৪৭.৮৪ সেকেন্ডে সাঁতরে অতিক্রম করেছে। নারী একই দুরত্ব ১০.৬২ সেকেন্ডে দৌড়ে এবং ৫৩.৫২ সেকেন্ডে সাঁতরে অতিক্রম করেছে। ৬৯

কেজীর পুরুষ ভারোত্তলন করেছে ৩৫৭.৫ কেজী আর ৬৯ কেজীর নারী উত্তোলন করেছে ২৭৫ কেজী। শারিরিক দক্ষতার এই ক্ষুদ্র পার্থক্য অবশ্যই নারীকে হেয় করে না কারন নিজস্ব কর্ম ক্ষেত্রে নারী তার দক্ষতা প্রাচীনকাল থেকেই প্রমান করে আসছে।

প্রাচীনকালে যখন থেকে নারী পুরুষ সামাজিকভাবে একসাথে থাকতে শুরু করলো তখন থেকেই দক্ষতানুসারে কিছু দায়িত্ব তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। খাবার যোগারের প্রধান দায়িত্ব নেয় পুরুষ এবং মোট কথায় সংসারের বাকী সব দায়িত্ব এসে পরে নারীর উপর। সাদামাটাভাবে দেখা যায় যে পুরুষ খাবার যোগারের পর বাকী সময়ে অন্য দায়িত্ব এড়ি য়ে চলার চেষ্টা প্রচীন কাল থেকেই করে আসছে। বতর্মানেও যে পুরুষেরা বাজার করতে বেশী আগ্রহী হয় এবং নারী তা রন্ধন এবং প্রকৃয়াজাত করতে, এই সংস্কৃতিটা আসলে লক্ষ বছরের প্রাচীন।

শক্তি বা ক্ষমতার পার্থক্য সবসময়ই অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে পীড় ন করতে উস্কানি দেয়। ঠিক একারনেই ভিন্ন মাত্রার ক্ষমতার অধিকারি হয়েও নারী পীড়ি ত হয়ে আসছে সেই প্রচীনকাল থেকে। ধর্মীয় কিছু সিদ্ধান্তও এই পীড়নকে বৈধতা দেয়ায় আমরা গোটা ব্যাপারটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আ-ঞ্চলিকভাবে সামাজিক প্রথা হাজার অযুত বছরে এখন একটা রূপ নিয়েছে যে, এটা একদিনে বা একজীবনে পাল্টে ফেলা দুরূহ। নারী এবং পুরুষের সহাবস্হান বিবতর্নের মধ্যদিয়ে অনেক দুরত্ব অতিক্রম করেছে। এই কিছুকাল আগেও ভাবা হতো যে, নারীর সাথে পুরুষের চিন্তাধারা এবং মুল্যবোধের পার্থক্য শুধুই সামাজিক বিবতর্নের ফসল। আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বস্তুগতভাবেও নারীর সাথে পুরুষের চিন্তধারা এবাং মুল্যবোধে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

নারী তুলনামুলক বেশী অনুভুতিশীল, নির্দিষ্ট বিষয়ে বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী এবং গঠনমুলক চিন্তায় অগ্রগামী, এই সব বৈশিষ্ট আসলে অনেকটাই বস্তুগত, ছোট একটি উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, নারী প্রায়শই বিভিন্ন স্মৃতিবিজরিত তারিখ ভুলে না যেয়ে পুরুষকে অস্বস্তিতে ফেলে, কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রই পুরুষ তা মনে রাখতে পারে না।

আমাদের মস্তিস্কের ডান অংশ এবং বাম অংশের কাজ ভিন্ন। ডানহাতি মানুষের মস্তিস্কের বাম অংশ দৈ ন্যন্দিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় (প্রধানত ভাষা এবং যুক্তি), অপর দিকে ম স্তিকের ডান অংশ অনুমান এবং আবেগের কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়। বামহাতি মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে ঠিক উল্টোটা। মজার ব্যাপার হচ্ছে ডানহাতি নারী তুলনামুলকভাবে তার মস্তিস্কের ডান অংশ ডানহাতি পুরুষের চেয়ে বেশী ব্যবহার করে।

লিঙ্গভেদে সবশিশুই সমান তালে বিকশিত হয়, একথা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই যে শিশুকাল থেকেই নারীশিশু নারী হবার এবং পুরুষশিশু পুরুষ হবার প্রস্তুতি নেয়। ছেলে শিশু মায়ের প্রভাবে মানবিকভাবে জগৎটাকে দেখতে শেখে কিন্তু বয়ঃসন্ধির পর যখন সে প্রথম পুরুষ হয়ে ওঠে, তখন সে বাইরের জগৎ থেকে পুরুষালী তথ্য সংগ্রহ করে। এই মুল্যবোধের বৈচিত্র তাকে কম ভোগায় না। বয়ঃসন্ধির পরই পরিবার সমাজ এবং লক্ষ বছরের লুকানো নির্দেশ তাকে স্বাবলম্বি হবার তাড় না যোগায়, নিজের শক্তিমত্তা তাকে মুগ্ধ করে, কখনো বা করে বেপরোয়া। ঠিক এই সময় কিশোরী যখন নারী হয়ে ওঠে, সে সাধারনত হয় ধীর, স্থির, দায়িত্বশীলা, মুগ্ধ হয় সে নিজের সৌন্দর্য দেখে, সাধ জাগে নিজেকে আরেকটু সুন্দর দেখতে। পুলকিত হয় নিজেকে অবহেলিত থেকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেখে।নারীর বয়ঃসন্ধি হয় পুরুষের কয়েকবছর আগে। সাধারনভাবে বলা হয় যে বয়ঃসন্ধির পর সমবয়সী নারীর বাস্তববুদ্ধি পুরুষের চেয়ে বেশী পরিপক্ক হয়, তাকে যে আদপে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব নিতে হবে, তা যেন সে আগেই উপলব্ধি করে। শারিরিক বয়ঃসন্ধি হয়ত অল্প সময়ে ই পরিপুর্নতা পায়, কিন্তু মানুষিক বয়ঃসন্ধি নারীপুরুষ উভয়েরই অনেক দীর্ঘ হয়। আর এক্ষেত্রেও এগিয়ে নারী। নারীর মানুষিক বয়ঃসন্ধি পুরুষের অনেক আগেই পরিপুর্নতা পায়।

ইউরোপের নারীরা তুলনামুলক অনেক অগ্রগামী। নারী পুরুষের সাথে প্রায় সময় তালে সব কাজের অধিকার পায়। বাস বা ট্রামের ড্রাইভার হিসাবে নারী যেমন পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে তেমনি প্রশাসনেও নারী পুরুষের সমানই গুরুত্ব পায়। আমাদের সমাজে ধর্মিয় এবং সামাজিক বাধা এগিয়ে যাওয়া দুরূহ, তাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে নারী এবং পুরুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট নির্নয় করা কষ্টকর। ইউরোপের বর্তমান বিবর্তেনর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট এখন স্পষ্ট।

ইউরোপের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অফিসে গেলে মনে হবে যেন প্রায় সবকিছুই নারী পরিচালিত। কিন্তু যদি শিক্ষকদের দিকে নজর দেয়া হয় তবে দেখা যাবে যে , বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮০-৮৫% শিক্ষক পুরুষ। এখানে অবশ্যই বলা যায় যে, পারিবারিক দায়িত্ববোধের কারনে অনেকক্ষেত্রে নারী উচ্চশিক্ষায় অপরাগ হয়। এবার শিক্ষার বিষয়ের উপর নজর দিলে দেখা যাবে বিশাল পার্থক্য। ২০০২ সাল থেকেই প্রথমবারের মতো ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে প্রায় সমান সংখ্যক ছাত্র এবং ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু বিষয় নির্বাচনে রয়েছে বিশাল পার্থক্য। কারিগরি বিষয়ে নারীর উপস্থিতি যতটা কম। প্রায় ততটাই কম মানবিক বিষয়ে পুরুষের হার। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিষয় নির্বাচনের এই পার্থক্য ভবিষ্যতের অনেককিছুই নির্বারন করে দেয়।

পুরুষসুলভ আচরন এবং নারীসুলভ আচরনের পেছনে হরমানের রয়েছে বিশাল ভুমিকা। নারীর ইস্ট্রোজেন হরমোন অনেকখানি ঠিক করে দেয় নারী কতটা নারীসুলভ হবে আর পুরুষের টেস্টোস্টেরন হরমোন নিয়ন্ত্রন করে পুরুষের পুরুষসুলভ আচরন । প্রতিটি মানুষের মধ্যেই নারী এবং পুরুষ সত্তার সহাবস্থান রয়েছে। প্রতিটি পুরুষেরই কিছু অংশ নারী এবং প্রতিটি নারীরই কিছু অংশ পুরুষ । নারী এবং পুরুষ উভয়েই প্রকৃতির অংশ, উভয়েই উভয়ের সম্পুরক। যারা এই বৈচিত্র মন থেকে মেনে নিতে না পেরে বিদ্রোহ করে, তাদের বেশ বড় একটা অংশ সমকামীতায় অবস্থান খুজে পায়। আমাদের অনেকের ই ভুল ধারনা রয়েছে যে সমকামীতা শারিরিক ব্যাপার আসলে সমকামীতা যত টা না শারিরিক, তার চেয়ে অনেক বেশী মানষিক।

রবীন্দ্রনাথ নারী এবং পুরুষ মানসিকতাকে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছিলেন দুটি কবিতায় –

নারীর উক্তিঃ

মিছে তর্ক– – থাক্ তবে থাক্
কেন কাঁদি বুঝিতে পারি না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধুচোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা,
আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই সব আঁখি তুলে চাওয়া।
ওই কথা, ওই হাসি ওই কাছে আসা আসি।
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?
কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল?
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
বুক ফেটে কেন অশ্রু পরে
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি

এ শুধি চোখের জল এ নহে ভর্ৎসনা

পুরুষের উক্তিঃ

সেদিন যে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন,
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়নে,
তখন উষার আধো আলো
পড়ে ছিল মুখে দুজনার
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।
কে জানিত শান্তি তৃপ্তি ভয়
কে জানিত নৈরাশায়াতনা।
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবী পুজা,
চেয়োনা, চেয়োনা তবে আর
এসো থাকি দুজনে সুখে দুঃখে গৃহকোনে
দেবতার তরে থাক পুষ্প অর্ঘ্য ভার।

নারী এবং পুরুষের যতই বৈচিত্র থাকুক না কেন, সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে প্রাথমিক মুলবোধের সমন্বয় এবং পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করে পথ চলা। নারী পুরুষ উভয়ের অবদানেই আজকের এই পৃথিবী।